স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়ে তা মুক্তি পেল ইং ১৯৯৭ সালে অরুনা সহ কলকাতা ও অন্যত্র বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

এ ছবির অপর নায়িকা রচনা ব্যানার্জী। প্রভাত রায়ের 'দুরন্ত প্রেম', সুখেন দাসের 'দান প্রতিদান'—এরকম গুটিকয়েক ছবিতে অভিনয় করে রচনা তখন পাড়ি দিয়েছিল উড়িষ্যায়, ওখানে ওড়িয়া ছবিতে ও চুটিয়ে অভিনয় করেছিল। আবার বাংলা ছবিতে রচনা ফিরল 'জীবন সন্ধান' ছবির হাত ধরে। একজন অতি সভ্য, ভদ্র, রুচিশীলা আধুনিকা বলতে যা বোঝায় রচনা ছিল তা-ই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা লিখল 'ফাটাফাটি অভিনয় রচনার' কিন্তু আমি বলব—ফাটাফাটি ব্যবহার রচনার।

মনে পড়ছে কলকাতার ডায়মন্ড হারবার রোডে জোকার কাছে 'পাম ভিলেজ'-এ শুটিং হচ্ছে। আমি, বিপ্লবদা ও শঙ্কর শট দিচ্ছি, রচনার কোনও শট হচ্ছে না। সারাদিন ও বসেই রয়েছে। কিন্তু এতটুকু বিরক্তি নেই রচনার। একেই তো বলে প্রকৃত শিল্পী। ১৯৮৯তে 'কলকাতা সুন্দরী' হয়েছিল রচনা। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ওর সঙ্গে কাজ করে অনুভব করলাম ও মনেতে আরও বেশী সুন্দরী। 'সত্যম শিবম সুন্দরম'।

তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে সেটে রচনার বাবা আসতেন। উনি ছিলেন অতীত দিনের এক শৌখিন অভিনেতা। 'জীবন সন্ধান' ছবির শুটিং চলাকালীন আমি আরও একটা ছবিতে অভিনয় করছিলাম। সুজিত গুহর 'মনসাকন্যা'। সেখানে রচনার বাবা প্রায়ই শুটিং দেখতে আসতেন। পরে 'জীবন সন্ধান' এর সেটে উনি রচনাকে আমার 'মনসাকন্যা' ছবিতে শুটিং এর কথা বলতেন। এই 'জীবন সন্ধান' ছবিটার ভাল পাবলিশিটি হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনা বেরিয়েছিল, সে সময়ে 'বসুমতী' পত্রিকায় আমার ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনের বহু কথা নিয়ে প্রায় আধপাতা জুড়ে নিবন্ধ বেরিয়েছিল। আমি এ ছবির শুটিং চলাকালীন কর্মসূত্রে ছিলাম কুচবিহারের দিনহাটায় 'অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিষ্ট্রার'। ওই দিনহাটাতেই পরিচয় হয়েছিল বিশাল মাপের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহর সঙ্গে, কমলবাবুও সেদিন আমার কাছে রচনার অভিনয়ের তারিফ করেছিলেন। কমলবাবুর বন্ধু ও 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সাংবাদিক শিবেন মণ্ডল-ও এ ছবিতে অভিনয় করেন। কমলবাবু ও শিবেনবাবু দুজনেই এখন প্রয়াত।

'জীবন সন্ধান' ছবিটা প্রথম দফায় সেরকম বানিজ্যিক সাফল্য পায়নি। কিন্তু পরের দফায় বিগ্‌বচ্চনের বিপরীতে রচনার অভিনীত হিন্দি ছবি 'সূর্য বংশম' মুক্তি পাওয়ার পর 'জীবন সন্ধান' যখন আবার মুক্তি পেল 'মিনার-বিজলী-ছবিঘর' এ তখন মাঝারি সাফল্য পেল।

এরপর রচনার যাত্রাপথ সুদীর্ঘ। প্রসেনজিৎ-মিঠুন-তাপস-চিরঞ্জিত-ফিরদৌস প্রমুখের বিপরীতে অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করে রচনা এখন এক উল্লেখযোগ্য তারকা।

আমার কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'বরকনে'। পরিচালক বাবলু সমাদ্দার। প্রসেনজিতের বিপরীতে এ ছবিতে অভিনয় করেছিল ইন্দ্রানী হালদার ও জুন মালিয়া। সঙ্গে সৌমিত্র চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্ত্তী, দীপঙ্কর দে, মনোজ মিত্র, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, শুভাশীষ মুখার্জী, চিন্ময় রায়, কল্যাণী মণ্ডল, নির্মল কুমার, অনামিকা সাহা ও অন্যান্য। ইন্দ্রানীর ডাক নাম 'মামনি'। লেখকদের প্রতি ওর বরাবরই বেশ শ্রদ্ধা ভাব। সেই সুবাদে আমাকে খুবই সম্মান করত। সে সময়টা ও খুবই ব্যস্ত শিল্পী। তবু শুটিং শিডিউল খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করত। আর সবচেয়ে বড় কথা-ও সব সময়ে হাসিখুশী ও প্রাণোচ্ছল থাকত। এ ছবির অভিনয়ের সময়ে বম্বেতে বিভিন্ন হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছিল, সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরছে তো রাতের ফ্লাইটে বোম্বোতে যাচ্ছে। এত স্বত্তেও শুটিং, ডাবিং কোথাও ইন্দ্রানীকে নিয়ে এতটুকু অসুবিধে হয়নি। 'বরকনে' মুক্তি পেয়েছিল ২০০২ এর ডিসেম্বর—ভাইফোঁটার দিন—'মিনার বিজলী-ছবিঘর' সহ ২২টি প্রেক্ষাগৃহে। এগার (১১) সপ্তাহ ধরে একটানা তিনটে শোতে ওই সব হলে ছবিটা চলেছিল। এই ছবিতে বম্বের সুরকার আশিসকুমারের সুরে ও গীতিকার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের কথায় অমিত কুমার ও আমার স্ত্রী শ্রীমতি জয়া হালদারের ডুয়েট গানে পর্দায় লিপ্ দিয়েছিল প্রসেনজিৎ ও ইন্দ্রানী। গানটা ছিল কলেজ ছাত্রছাত্রীর পিকনিকের গান। স্বভাবতঃ গানের সঙ্গে নাচ ছিল। ওই গানে সুইমিং লেকের এক দৃশ্যে ইন্দ্রানী বোম্বে থেকে আনা খুব ছোট সুইমিং কস্টিউম পরেছিল। ওই পোশাকে ইন্দ্রানীকে দেখে প্রসেনজিৎ (বুম্বা) বলেছিল—'আর একটু ছোট পরলেও পারতিস।' ওই ছবিতে বেশ কিছুদিন শুটিং হয়েছিল কলকাতার সন্তোষপুরে সার্ভে পার্কের জাহাজ বাড়ীতে। ওরই কাছাকাছি এক কালীমন্দিরে নির্মলকুমার, প্রসেনজিৎ ও ইন্দ্রানীকে নিয়ে শুটিং হয়েছিল।

'বরকনে' ছবি যখন মুক্তি পেল তখন ছবির অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীর সঙ্গে ইন্দ্রানীর সে কি আনন্দ। আজ এত দিন পরে সেসব কেবলই স্মৃতি। ছবিটার নির্মাণ পর্বে আমি চাকরীসূত্রে ছিলাম বর্ধমানের কালনা ও পরে মুর্শিদাবাদের

ভগবানগোলায়, এরপর জলপাইগুড়িতে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার হিসেবে জয়েন করলাম। এ সময়েই জলপাইগুড়ি থেকে অল্প দূরত্বে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় ইন্দ্রানীর বিয়ে হল এক বিমানকর্মীর সঙ্গে।

জলপাইগুড়িতে থাকাকালীন ২০০৫ সালে আমার পরিচালনায় বাংলা রহস্যছবি 'নিশাচর' তৈরী হল। এ ছবিতে কাহিনী চিত্রনাট্য ছাড়া ও গানও লিখেছিলাম আমি। এ ছবিতেই আমার বিপরীতে অভিনেত্রী হিসেবে পেলাম শতাব্দী রায়কে। আমি ফরেস্ট অফিসার। চরিত্রের নাম সুদীপ্ত। ছবিতে শতাব্দী আমার স্ত্রী। চরিত্রের নাম 'পর্ণা'। সত্যি কথা বলতে কি—এ ছবির গল্পটা আমি লিখেছিলাম ঋতুপর্ণাকে ভেবে। তাই চরিত্রের নামও দিয়েছিলাম 'পর্ণা'। গল্পটা ঋতুর খুব ভাল লেগেছিল। ছবির প্রযোজক মহম্মদ রহিমের সঙ্গে ওর চুক্তিও হয়ে গিয়েছিল। ছবির শুটিং শুরু হবার ঠিক দুদিন আগে ঋতুর তরফ থেকে টানা শুটিং ডেট্ দেবার ব্যাপারে অসুবিধে হল। তাই ঋতুর বদলে শতাব্দী সাজল পর্ণা, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এ ছবিটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকেশনে একটানা আঠার দিন শুটিং এ শেষ হয়েছিল। কলকাতায় মাত্র ১(এক) দিন ও ১ (এক) রাত শুটিং হয়েছিল কলকাতার নেচার পার্কে। উত্তরবঙ্গে প্রতিদিন শুটিং চলেছিল সারাদিনে সর্বোচ্চ ২২ ঘঃ ও সর্বনিম্ন ১৬ ঘঃ হারে। স্পষ্টতঃই বিশ্রাম ও খাওয়া দাওয়ার সময় খুবই সামান্য। এমনিতে আমি একটানা কাজ করতে খুব ভালবাসি, আর এ ছবিতে আমার পাশে পেয়ে গেলাম আর একজন কাজপাগল খ্যাপা নায়িকাকে যার নাম শতাব্দী রায়, সঙ্গে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ, খরাজ মুখার্জী, শুভাশীষ মুখার্জী, ভোলা তামাং, শম্ভু ভট্টাচার্য ও জয়িতা রায় (মুম্বাই)। এ ছবিতে আমার লেখা ও শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া গানে একক শিল্পী হিসেবে পর্দায় লিপ দিয়েছিল শতাব্দী। গানটার শুটিং করেছিলাম নেচার পার্কে সারারাত ধরে। ওই গানের শুটিং এর জন্য শিবমূর্তি বানানো হয়েছিল। শতাব্দী খুবই আবেগ মথিত ভাবে ওই গানের দৃশ্যে অভিনয় করেছিল। সে রাতে শুটিং এর ফাঁকে ফাঁকে শতাব্দীকে দেখেছি ওর নিজের মোবাইলে কি একটা দেখ্‌তে। পরে জেনেছি ওই মোবাইলে ওর ছেলের ছবি save করা ছিল। শুটিং এর ফাঁকে ওই রাতে শতাব্দী ওই ছবিটাই দেখছিল, উত্তরবঙ্গে শুটিং চলার সময়ে ওর সঙ্গে ওর ওই ছেলে ছিল। শুটিং এ সাপ (snake) ব্যবহারও হয়েছিল। কিন্তু হিজড়েও অভিনয় করেছিল। আর ছিল প্রচুর গ্রাফিক্সের কাজ। অভিনয়ে এতটুকু ক্লান্তি দেখিনি শতাব্দীর মধ্যে। খুবই মিষ্টি স্বভাবের ও নরম মনের মানুষ শতাব্দী। ওর বাসায় গেছি, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি, গল্প করেছি, শুটিং ও ডাবিং এর সময়ে খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি। কখনও কোথাও ওকে এতটুকু স্টাইলাইজ্‌ড বলে মনে হয়নি। বরং সর্বত্রই দেখেছি—ও একটু লাজুক স্বভাবের দরদী বাঙালী মেয়ে। 'নিশাচর' মুক্তি পেয়েছিল ২০০৫ সালে দর্পনা, পূরবী ও ভারতীতে।

২০০৭ সালে শুরু হলো আমার পরিচালিত দ্বিতীয় ছায়াছবি 'প্রেয়সী', এ ছবিতে কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ আমার। এ ছবির গানও লিখেছিলাম আমি। 'প্রেয়সী' আমার কাহিনী ও চিত্রনাট্যে চতুর্থ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। নায়িকা হিসেবে introduce করালাম 'পাওলী দাম'কে। পাওলি তখন ছোট পর্দায় অভিনয় করছে। এর আগে মাত্র দুটো সিনেমায় কাজ করেছে। বাসু চ্যাটার্জীর 'মেঘ বৃষ্টি রোদ' আর ভেঙ্কটেশ ফিল্‌ম্‌সের ব্যানারে 'আই লাভ ইউ'। দুটো ছবিতেই পাওলির ভূমিকা ছিল পার্শ্বনায়িকা হিসেবে। সেই বিচারে 'প্রেয়সী' ছবিই নায়িকা হিসেবে পাওলির প্রথম ছবি। নায়ক মুম্বই এর প্রখ্যাত অভিনেত্রী রানী মুখার্জীর ভাই সম্রাট মুখার্জী। অপর নায়িকা নৃত্যপটিয়সী ইন্দ্রানী দত্ত। সঙ্গে অভিষেক, মৃণাল মুখার্জী, মনোজ মিত্র, চিন্ময় রার, অনামিকা সাহা, দেবরাজ রায়, অনুরাধা রায় ও অন্যান্য। এ ছবিতে আমি হলাম পাওলীর দাদা। কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং হয়েছিল। পাওলী উত্তরবঙ্গে চারদিন শুটিং করেছিল। প্রায় নবাগতা পাওলীকে ঘিরে সেদিন উত্তরবঙ্গের মানুষের সে কি উন্মাদনা। যেভাবে ওকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের মানুষজন অটোগ্রাফ নিচ্ছিল ও আন্তরিক ঘরোয়া নিমন্ত্রণ করছিল তাতে পাওলী অভিভূত হয়েছিল। অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রতিভাশালী অভিনেত্রী হিসেবে পাওলীকে দেখেছিলাম। ও একটু রিজার্ভ স্বভাবের। ইন্‌ডোরে টেকনিসিয়ান, এন.টি.ওয়ান স্টুডিওর ফ্লোরে কিংবা আউটডোর শুটিংএ সর্বত্রই ওকে দেখেছি একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের। পোশাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহারে সর্বক্ষনই এক রুচিশীলা আধুনিকা শিক্ষিতা রমনী হিসেবেই পাওলীকে দেখেছিলাম। ব্যক্তিজীবনে যতদূর জানি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে এম. এস. সি.।

'প্রেয়সী' মুক্তি পেল ২০০৯-এ। এরপর পাওলী সুযোগ পেল 'কালবেলা' ছবিতে। তারপর 'মনের মানুষ' ছবিতে প্রসেনজিতের বিপরীতে, এরপর পাওলী অভিনীত বহু ছবি। বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে 'ছত্রাক' এবং হিন্দি ছবি বিক্রম ভাটের 'হেট স্টোরি' পাওলীকে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। 'প্রেয়সী' ছবির পাওলী এখন অনেক সাহসী এবং বিতর্কিত। তবে তেজ, ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় ক্ষমতা সেদিনও পাওলীর ছিল, আজও আছে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও ঈশ্বরবোধ

মহুল মুখার্জী
এ. ডি. এস. আর., ডায়মন্ডহারবার

বিশ্ব-তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর-তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, প্রাচীন যুগ থেকে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত অল্প কয়েকতি ধর্মমত ছাড়া প্রায় সব ধর্মেই ঈশ্বরকে ব্যক্তি ঈশ্বর বা Personal God হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যেন মানুষের আকারধারী ও মানুষের মত গুণ সম্পন্ন। এই মতবাদকে বলা হয় নবত্বারোপ বা anthropomorphism. এই মতবাদ অনুযায়ী, এই বিশ্ব ঈশ্বর থেকে আলাদা। তিনি নিজের খুশী মত বিশ্বকে চালাচ্ছেন ও প্রতিটি ঘটনা ঘটাচ্ছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট যুক্তিবাদ ও বিচারবোধের প্লাবন এই মতবাদের বিরোধিতা করে। ঐ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) মানুষের আকার ও গুণ সম্পন্ন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন না। পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই Personal God ও প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস করতেন না বলে ধর্মযাজকেরা ও বহু ব্যক্তি তাঁকে জড়বাদী ও নাস্তিক বলতেন। নাস্তিক মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস। কিন্তু আইনস্টাইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনোদিন বিশ্বাস হারাননি এবং এই জন্যই-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কণা বলবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানীদের যুক্তিকে ও মূল সত্যকে জানতে চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু ঈশ্বরের মানবাকৃতি রূপকে অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন স্পিনোজার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর।' আইনস্টাইন মনে করতেন যে, সত্তা আদি অন্তহীন, অন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল নয় এবং অনন্তকাল ধরে পরমরূপে (obsolute) বিরাজমান, যার অসংখ্য গুণ, অঙ্গক্রিয়া ইত্যাদির প্রত্যেকটিতে প্রকাশিত হচ্ছে শাশ্বত ও সীমাহীন অস্তিত্বের, যার বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতে পারে না বলে বাইরের কোন কিছুর দ্বারা তার ভেতরে কোনো ক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে না এবং এইজন্যই যা নিজের নিয়মে চালিত হয়, যা হল অনন্ত উপলব্ধিতে ঘটে যাওয়া সব কিছুর ফলপ্রদ কারণ, যার সত্য হল সবকিছুর সত্য তা-ই হল ঈশ্বর বা প্রকৃতি। যেহেতু প্রকৃতির শক্তি ও কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা আর ঈশ্বরের শক্তি ও কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা এক এবং প্রকৃতির নিয়মাবলী ঈশ্বরেরই নিয়ম, সে জন্যই প্রকৃতির শক্তি অসীম এবং তার নিয়মাবলীতে আছে সব কিছু, যা ঈশ্বর কল্পিত। মানুষ যত প্রকৃতির ঘটনাবলীর কারণ উপলব্ধি করবে, ততই তার ঈশ্বরের জ্ঞান বাড়বে। প্রকৃতিতে অচিন্তনীয় বিরাট শক্তির অস্তিত্ব, যার অতি সুন্দর সমন্বয়রূপে প্রকাশ প্রতিটি ঘটনার বাস্তবতার ভেতর দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি—তাই ছিল আইনস্টাইনের কাছে ঈশ্বর আর সেই উপলব্ধি করার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর কাছে ধর্ম। প্রকৃতির ঘটনাবলীতে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা মানতে হলে, মানতে হবে causality ও determinism অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক। এতে ছিল আইনস্টাইনের প্রবল বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা বলে কিছুই নেই। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্যকারণের কোন ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে, কেননা জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে।"

কণিকা জগতে তরুণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার (Probability and uncertainity) তত্ত্বকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। কিসের অভাব থেকে কণিকা-জগতের নিয়মাবলীতে কল্পনাতীত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা-ই ছিল তাঁর চেষ্টার বিষয়, তাঁর মতবাদ ছিল, সম্ভাব্যতার গণ্ডী পেরিয়ে সমস্ত ঘটনার মূলসত্যস্বরূপ একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের (Unified field theory) সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

হ্যাপি প্রিন্স

বিশ্বরূপ গোস্বামী

এ. ডি. এস. আর., সালার

সেদিনের সন্ধ্যাকাশ জুড়ে তারাদের মেলা। উজ্বল আকাশের নীচে বইছে আদিগঙ্গা, স্রোতে স্রোতে তার বয়ে চলা—মিলিত হচ্ছে হুগলী নদীর পথে। এমনি সন্ধ্যের আবহে আদিগঙ্গা থেকে বয়ে আসছে বাতাস। দূরে বেশ কিছু দূরে মোহনার কাছে নদীতে সাহেবদের বিরাট পালতোলা জাহাজ নোঙর করেছে। নিত্য নতুন নতুন বেশে সাহেবদের আনাগোনা, চারিদিকে ফিস্‌ফাস আগন্তুকদের নিয়ে। গোবিন্দপুর গ্রামটি-ও আদি গঙ্গার ধারে, সেখানে বেশ কয়েকঘর জেলেদের বাস। আজ সন্ধ্যেতে তাদের ঘরে ঘরে গুঞ্জন—তেলের বাতি নিবছে না রাত্রির আকাশে— তাদের গাঁয়ে যে অতিথি এসেছে সুদূর বাংলাদেশের যশোর থেকে তিনি জাতে ব্রাহ্মণ—শ্রী পঞ্চানন কুশারী। সময় সপ্তদশ শতকের শেষ দশক। পঞ্চানন কুশারী একা আসেন নি সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কাকা শুকদেব। গোবিন্দপুর এর গরীব মানুষগুলি খুশি হলেন তাদের গ্রামে এক ঘর ব্রাহ্মণ পেয়ে। এরাই কুশারী কে বদলে দিলেন 'ঠাকুর' এ। তাঁরই সঙ্গে কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে পঞ্চাননের মেলামশা বাড়তে লাগল। কোম্পানির জাহাজে সম্ভবতঃ একটি কাজও পেলেন পঞ্চানন। পঞ্চাননকে গোবিন্দপুর গ্রামের মানুষরা 'ঠাকুর' বলত বলে—সাহেবরাও তাই-ই বলত তবে উচ্চারনের বিকৃতিতে তা 'টাগুর' ও পরে 'টেগোর' এ পরিণতি পায়। জানা যায় সাহেবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়িয়ে পঞ্চানন টেগোর সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন।

কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে কলকাতার প্রথম কালেক্টর (১৭০৭সালে) রাল্‌ফ সেলডন পঞ্চাননের দুই ছেলে—জয়রাম ও সন্তোষরামকে আমিন পদে নিয়োগ করেন। যাঁদের মূল কাজ ছিল রাজস্ব আদায় এবং সুতানুটি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমি জরিপের কাজ করা। এই কাজে থাকার সুবাদে এবং কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকায় জয়রাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং ধন্নসই (পরবর্তীকালে ধর্মতলা) অঞ্চলে বসতবাড়ি তৈরী করেন। বসতবাড়ির সংলগ্ন জমিতে ছিল জয়রামের বৈঠকখানা বাড়ি। বর্তমানে যেটি ফার্ট উইলিয়াম, তার সংলগ্ন অঞ্চলে জয়রামের বাগান বাড়ি ছিল। যা পরবর্তী কালে কোম্পানি খাস করেন ফোর্ট এর পুনর্নির্মানের জন্যে। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর 'Memoir' এ জয়রাম প্রসঙ্গে বলেন 'বাস্তবিক পক্ষে তিনিই ছিলেন ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা'। জয়রামের চার ছেলে ও এক মেয়ে। তার মধ্যে দুই ছেলে নীলমনি ও দর্পনারায়ণ যৌথভাবে পাথুরিয়া ঘাটায় গঙ্গার ধারে একটি বসত বাড়ি তৈরী করেন। দাদা নীলমণি প্রথমে ওড়িশার কালেক্টরটে এবং পরে চট্টগ্রামের জেলা কোর্ট এর সেরস্তাদার এর কাজে নিযুক্ত হন। ভাই দর্পনারায়ণ চন্দননগরের ফরাসী বনিকদের কুঠিতে দেওয়ানরূপে প্রচুর আয় করেন এবং তিনি পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে থাকতেন। নীলমণি তাঁর আয় এর সমস্ত অর্থ সবই পাঠিয়ে দিতেন ভাইকে। কিন্তু তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে ঝগড়া এবং নীলমণি গৃহত্যাগ করলেন; চিৎপুরের—জোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটি বসতবাড়ি প্রতিষ্ঠা করলেন। নীলমণির তিন ছেলে এবং এক মেয়ে। রামলোচন, রামমনিও, রামবল্লভ এবং মেয়ে কমলমনি। রামলোচন ছিলেন, উদার মনের সংস্কারহীন একটি মানুষ—নাচগানের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রখর বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন। রামলোচনের স্ত্রী অলকাসুন্দরীর একটি কন্যা সন্তান হয় যার অবশ্য জন্মের পর পরই মৃত্যু হয়। ভাই রামমনি কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী মেনকা ছিলেন অলকাসুন্দরীর নিজের বোন। রামমনি এবং মেনকার দ্বিতীয় ছেলে দ্বারকানাথ জন্মালেন ১৭৯৪ সালে। রামলোচন দ্বারকানাথকে জন্মের সময় থেকেই অর্থাৎ ১৭৯৪ সালেই দত্তক নিলেন, সেটি আইনসঙ্গত হয় ১৭৯৯ সালে। বালক দ্বারকানাথের পড়াশোনা শুরু হয় ঠাকুর বাড়িতেই এবং তাঁর ধর্মশিক্ষা শুরু হয় দত্তক-মা অলকাসুন্দরীর কাছে। ১৮০৪ সালে দ্বারকানাথের বয়স যখন দশ, তাঁকে চিৎপুর রোডেশেরবোর্ন সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়—কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বারকানাথ হলেন শেরবোর্ন সাহেবের অন্যতম প্রিয় ছাত্র। দ্বারকানাথের ইংরাজী শেখা এবং শিক্ষিত ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্ব করার প্রবনতা ছিল সেই কিশোর বয়স থেকেই। ১৮০৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর, দ্বারকানাথের বয়েস তখন তেরো, রামলোচনের মৃত্যু হল। কিশোরীচাঁদ মিত্রের

'Memoir' থেকে জানা যায় মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে রামলোচন তার নিজের সব সম্পত্তিই উইল করে যান দ্বারকানাথকে। কলকাতা শহরের জমি ও বাড়ি এবং মফঃস্বলের জমিদারি যার মধ্যে ছিল কুষ্টিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগনা এবং কটক জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ও বালিয়া।

দ্বারকানাথ তখন ষোলো—লেখাপড়া শেষ করে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন—রামলোচন তাঁর মৃত্যুর আগেই যা দিয়ে যান অলকাসুন্দরীর তত্ত্বাবধানে। সেই সময় থেকে দ্বারকানাথ জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই হোক বা নিজের ইচ্ছা বশতঃই হোক দেশের আইনকানুন ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হোন। সে কালের বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার রবার্ট কাট্‌লার ফার্গুসনের সংস্পর্শে এলেন এবং শিক্ষনবিশ হিসাবে তাঁর কাছে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন' এবং প্রধান সব আইনের পাঠ নিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র 'Memoir'এ লিখলেন.....'যে দু'জন ব্যক্তি তাঁর প্রথম জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা হলেন রামমোহন রায় এবং মিঃ কাট্‌নার ফার্গুসন।' রামমোহন তাঁর মনন শক্তি উদ্বোধনে সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁর আইনবিষয়ক চিন্তাকে জাগ্রত করেছিলেন ফার্গুসন। আইন বিষয়ে এতটাই পারদর্শী আর দক্ষ হয়ে উঠলেন যে যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়, ত্রিপুরার মহারাজা, কাশিমবাজারের কুমার হরিনাম এবং আরও অনেক জমিদার বহুবার মামলা মকদ্দমায় —সরাসরি তার কাছে পরামর্শ নিতেন। প্রপৌত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনী'তে লিখেছেন—উকিল না হয়েও তিনি ওকালতি ব্যবসা খুলেছিলেন এবং মোটা 'ফি' আদায় করতেন। অন্য ভাষায় লেখা দলিল ইংরাজীতে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তখনকার দিনে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের জন্য 'ফি' ছিল লাইন প্রতি একটি করে ডবল গিনি। এইভাবে দ্বারকানাথ মাসে মাসে বহুসহস্র টাকা আয় করতেন।

সতেরোর দ্বারকানাথ এর বিয়ে হল নয় এর দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী যশোরের পীরালি বংশের মেয়ে—ভীষণ সুন্দরী, অসামান্য লাবণ্যে পূর্ণ এক নারী। অবশ্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'জীবনী' গ্রন্থে বলেছেন 'বিবাহ হয়েছিল ১৮০৯ অব্দে যখন দ্বারকানাথের বয়ংক্রম ছিল পনেরো ও দিগম্বরীর ছয় বছর মাত্র'। অবশ্য অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ সংখ্যায় 'দ্বারকানাথের পরিবার' প্রবন্ধে বলেছেন 'বিবাহ হয় ১৮১১ অব্দে যখন কন্যার বয়স ছিল নয়'। এমন বয়সী রূপসী মেয়ের মুখের আদল এমন যে 'জোড়াসাঁকোর বাড়ির পুজোয় যে জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা গড়া হত তাঁর মুখমণ্ডল তৈরি হত দিগম্বরীর মুখের মত।' যখন তিনি বয়সে কম তখন থেকেই তিনি ভীষণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। তবে তিনি মাত্রাতিরিক্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন। প্রতিদিনই ভোরে গঙ্গা স্নানে যেতেন এবং স্নান সেরেই হরিনামে বসতেন। নিরামিষ আহার আর হরিনাম জপ দিয়ে সন্ধ্যার অবসরে দিনের শেষ হত। এই ছিল তার রোজকার রুটিন আচার অনুষ্ঠান। ১৮৩৯ এ দিগম্বরী মৃত্যু হয়—। আঠাশ বছরের বিবাহিত জীবনে একটি মেয়ে ও পাঁচ ছেলে। কেমন ছিল উচ্চাভিলাষী, প্রমত্ত, আধুনিক, সাহসী —উদ্যমী, বোহেমিয়ান এবং আরও অনেক গুনের মানুষটির সঙ্গে অতি ধর্মভাবাপন্ন প্রাচীনপন্থী দিগম্বরীর সম্পর্ক? দ্বারকানাথের সাহেবী জীবনযাত্রা, উদ্দাম ভেসে বেড়ানো, বৈঠকখানা ঘরে খানাপিনার আয়োজন দ্বারকানাথ দিগম্বরীর দাম্পত্য জীবনে শীতলতা এনেছিল অনেকটাই। দ্বারকানাই যখন বেশ দ্রুত তাঁর জীবনের রেখাচিত্রে উপরের দিকে উঠছেন— তখন তিনি পরিবার ও সামাজিক সংস্কার গুলোকে একটা একটা করে ভেঙে ফেলছেন, দুরত্ব তৈরী হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর । ঠাকুর পরিবার বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিতেন ও ধর্মশিক্ষা করতেন। হরিমোহন গোস্বামীর স্ত্রী কাত্যায়নীদেবী ছিলেন দ্বারকানাথের মা অলকাসুন্দরীর মা-গোঁসাই।

১৮৩৮ এর মার্চ মাসে মা অলকাসুন্দরীর মৃত্যু পর্যন্ত দ্বারকানাথ ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধি নিষেধ তেমন একটা ভাঙ্গেন নি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিন সামাজিক নিষেধকে বড় একটা মানতে চাইতেন না—কিন্তু দত্তক মা অলকাসুন্দরী যাতে কষ্ট না পান সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন—তাই ঠাকুর বাড়ির গন্ডীর মধ্যে অলকাসুন্দরীর বিধি দ্বারকানাথ মেনে নিতেন। অবশ্য অলকাসুন্দরীও দিগম্বরীর তুলনায় অনেক বেশী উদার ছিলেন, তিনি জানতেন ও বুঝতেন যে বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় এবং বাড়ীতে এনে আপ্যায়ন ও করতে হয়। তিনি শুধু বলতেন 'দ্বারকানাথ যেন এক টেবিলে বসে সাহেব মেমদের সঙ্গে অখাদ্য(গোমাংস) না খান, যেন কেবল দুএক পাত্র

পান করে গৃহকর্তার কর্তব্য পালন করেন।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখলেন,' দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়েছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল,'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না!' অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁর মত নাই তিনি বলিলেন যে, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস্ নে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না'।' অলকাসুন্দরী-দ্বারকানাথকে ও তার দৃঢ় চিত্তকে সঠিকভাবে চিনতেন। ১৮৩৯ এ দিগম্বরী যখন মৃত্যু শয্যায়, কারও সাহস হয়নি গঙ্গাযাত্রার কথা বলতে এবং কলকাতার বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য এসে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করেছিল। এতটাই আধুনিক মনের ছিলেন তিনি।

১৮৩৮ সালে এসিয়াটিক জার্নাল লিখেছিলেন, '২৩মার্চ তারিখে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কাঙালী বিদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন—সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে আট আনা পেয়েছিলেন আর বাকি সকলে জাতি-বর্ণ-বয়ঃক্রম নির্বিশেষে মাথাপিছু চার আনা করে পেয়েছিল। কাঙালী-বিদায় হয়েছিল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরের দিন।"

মা অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর আগে থেকেই পুজো—উপবাস-ব্রত এই সব পালন করতে করতে দিগম্বরী ধীরে ধীরে গভীর সংস্কারের জীবনে ঢুকে পড়ছিলেন। যদিও তিনি পাঁচ ছেলের মা ঃ দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ এবং এক মেয়ে যে জন্মের পর পরই মারা যায়। তবুও সেবা ব্যতীত দ্বারকানাথের সঙ্গে সব সম্পর্ক প্রায় ত্যাগ করেছিলেন ১৮২৯ সাল নাগাদ। যদিও স্বামীর সাহেব সংসর্গ থেকে মুক্তির জন্যে তিনি যাগযজ্ঞ করেছিলেন এবং তিনদিন পূর্ণ উপোস করেছিলেন। তাতেও যখন দ্বারকানাথের সাহেব সংসর্গ কমল না তখন থেকেই তিনি স্বামীর মুখ দেখতেন না, ছায়া দেখলেও গঙ্গা স্নান করে শুদ্ধ হতেন। দিগম্বরীর মৃত্যুর আগের দিন তেরবছরের ভূপেন্দ্রনাথের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ১৮৩৯, ২৪ জানুয়ারী 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' কাগজ লিখল ঃ দ্বারকানাথের পরিবারে দুটি শোকবহ ঘটনা পরপর ঘটে যাবার ফলে তিনি খুবই কাতর হয়েছেন। তাঁর মধুর স্বভাবের প্রতিশ্রুতিমান তেরো বছরের পুত্রটি গত শনিবার অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। পরবর্তী দিবসেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় দ্বারকানাথের শোক গভীরতর হয়েছে।' কষ্ট পেলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ—কিন্তু তা হৃদয়ের কোনে চাপা রেখেই আবার মগ্নও হলেন জমিদারি পরিচালনায়, ব্যবসায়, উদ্যোগে।

Blair B. Kling তাঁর 'Partner in Empire' গ্রন্থে বলছেন, 'জমিদারি তাঁর কাছে ছিল ব্যবসা—ব্যবসাদার সুলভ শৃঙ্খলায় তিনি জমিদারি পরিচালনা করতেন। তাঁর সেই পটুতার মধ্যে দয়ামায়া বদান্যতার কোনো স্থান ছিল না।' তাই জমিদার হিসেবে তিনি প্রজা হিতৈষী বা স্বতন্ত্র কিছু ছিলেন না। বিলেতে তাঁর বন্ধুস্থানীয়রা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ। তাঁর রাজকীয় ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাত্রা তাঁকে 'রাজা'র নাম দিয়েছিলে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জমিদারির অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগনা পেয়েছিলেন পৈতৃক সূত্রে। আর রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম জমিদারি, ১৮৩০ সালে, পাবনা জেলার সাহজাদপুর জমিদারি ১৮৩৪এ কিনেছিলেন তিনি নিজে। ১৮২২ সালে চব্বিশ পরগনার জেলা-কালেক্টরে সেরেস্তাদার হিসাবে প্রথম কোম্পানির চাকরিতে ঢুকলেন। চাকুরি ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের দক্ষতায় ট্রেভর প্লাউডন খুশি হন এবং সেরেস্তার হিসেবে তাঁর ছ'বছরের কর্মজীবনে লবন বিভাগের আয় শতকরা ত্রিশগুণ বেড়ে যায়। দ্বারকানাথের কাজের দক্ষতা দেখে আবগারী, লবন ও আফিম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হেনরি মেরিডিথ্ পার্কার তাঁকে বোর্ডের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৪ ও পার্কার তাঁর প্রতিবেদনে লিখলেন ঃ "দেখেছিলাম লবন বিভাগে জাল, জোচ্চুরি, ঘুস, তহবিল-তছরূপ প্রভৃতি উপদ্রব ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। বিভাগে একজনও কর্মচারী ছিলেন না, যিনি এই যোগসাজস বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। ফলে এই বিভাগ থেকে রাজস্ব আদায় ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। যখন লবন বিভাগের এই প্রকার নিদারুন দুরবস্থা, সে-সময় দ্বারকানাথ তাঁর কর্মদক্ষতা, শ্রমনিষ্ঠা, উদ্যম এবং সততা দিয়ে যদি আমার সহায়তায় এগিয়ে না আসতেন, তা হলে হয়ত আমার পক্ষে এই বিভাগের সংস্কার সাধন অসম্ভব হত।' কোম্পানির

এই দক্ষ দেওয়ান—বারো বছর কাজ করে ইস্তফা দিলেন।

প্রথম বাঙালী উদ্যোগ-পতি দ্বারকানাথ সময়, সঞ্চিত অর্থ দুটোই নিয়োগ করতেন সঠিক ভাবে। অল্প বয়েস থেকেই জমিদারি থেকে যা আয় হয়েছে বা পরবর্তী সময়ে আইন-সংক্রান্ত কাজ করে যা আয় করেছেন তা তিনি বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগে কাজে লাগিয়েছেন—তেজারতি'র ব্যবসা করেছেন, জমি-কেনা বেচার ব্যবসাও করেছিলেন। ১৮২৮ সালে বারো লাখ টাকার মূলধন নিয়ে কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের সহযোগে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' পত্তন করলেন। অবশ্য তার আগেই তিনি ১৮২২ সালে ওরিয়েন্টাল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি নামে বিমা সংস্থা খোলেন। ১৮৩৪ এ কোম্পানির চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে শুরু করলেন 'কার, টেগোর এন্ড কোম্পানি', যার কারবার ছিল বিদেশে রেশম, ধান, চিনি, রাম্-মদ, নীল, কাঠ ও চাল সরবরাহ করা, সেই সময়কার প্রথম দেশীয় উদ্যোগে যৌথ ব্যবসা এবং একটি **'Business House'**. অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন ঃ 'স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি সত্যই ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে প্রথম উদ্যোগী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সরকারী-চাকুরীর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এদেশের বুর্জোয়া সমাজ এতদিন আবদ্ধ ছিল—দ্বারকানাথ সেই গন্ডী থেকে সর্বপ্রথম বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন।' কার টেগোর কোম্পানি জাহাজ ভাড়া দেওয়া ও মাল আমদানি রপ্তানি করত। চা বাগানের ব্যবসাতেও উদ্যোগী হয়েছিল কোম্পানি। পরে এই কোম্পানি রানীগঞ্জের কয়লাখনি কিনেছিল। ফলতঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লার ডিপো করে কয়লা বিক্রি শুরু করলেন—অর্থবৃদ্ধি তো হলই তাছাড়া চারিদিকে তাঁর প্রভাব বাড়ল।১৮৪৩ এ প্রথম বিদেশ ভ্রমণ সেরেই দেশে ফিরেই **'Bengal Coal Company'** স্থাপন করলেন। তিনি বোধ হয় চেয়েছিলেন দেশীয় উদ্যোগ বাড়তে বাড়তে একসময় এতটাই বড়ো হবে যে তা একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও অংশীদার হবে। শিল্প বাণিজ্যে তিনিই বাঙালী অগ্রদূত।

এমন প্রানবন্ত মানুষটি যেমন জীবনে উপার্জন করেছেন, তেমনি ভোগ করেছেন জীবনের প্রতিটি বিন্দু। নিজের জীবনের স্বাধীন ধারায় যেন কোনো বাধা না আসে তার কারনে তিনি দমদম অঞ্চলের কাছেই বেলগাছিয়াতেই অনেকটা এলাকা জুড়ে বাগান সমেত 'বেলগাছিয়া ভিলা' কিনে ফেলেন এবং জোড়াসাঁকোর বসতবাড়ির সামনেই তিনতলা বৈঠকখানা বাড়ি নির্মান করলেন। সেই সময় বেলগাছিয়া ভিলা উৎসবের প্রাণবিন্দু ছিল— বিরাট ভোজসভা হত মাঝে মাঝেই। সমসময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড (১৯৩৬-৪২) অনেকবারই বেলগাছিয়া ভিলার ডিনার পার্টিতে এসেছিলেন সঙ্গে ছিলেন তাঁর বোন এমিলি ইডেন। ভারতবর্ষ থেকে তিনি (এমিলি) যেসব চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটিতেই বেলগাছিয়া ভিলার পার্টির প্রসঙ্গ আছে। ৩০শে নভেম্বর, ১৮৩৬ এর চিঠিতে লিখলেন, 'এত চমৎকার উৎসব ইতিপূর্বে আমি অল্পই দেখেছি। দেখে মনে পড়ছিল লর্ড হার্ডফোর্ড অনুষ্ঠিত উৎসবের কথা। ভারি সুন্দর আতস বাজির খেলা। একটি কামরায় বসেছিল ফরাসী অভিনেতা ও গাইয়েরা। অপর একটি কামরায় চলছিল নাচ। বিনোদন ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক ছিল না, একটি শেষ হতেই অন্যটি শুরু হচ্ছিল।' বেলগাছিয়া ভিলার নৈশ ভোজে বইত মদের স্রোত। দ্বারকানাথের কার টেগোর কোম্পানি প্রচুর পরিমানে বিদেশী মদ আমদানি করত কিন্তু মদের খুচরো ব্যবসাটা ছিল সাহেবদের দখলে। বেলগাছিয়া ভিলায় মদের স্রোত নিয়ে বাগবাজারে রূপচাঁদ পক্ষী লিখেছিলেন ঃ

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয়
ছুঁরি কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা,
আমরা তার কি জানি?
মদের কত গুনাগুণ
আমরা তার কি জানি,
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাই বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে বিলক্ষণ জানি— এসব কথা নিন্দুকের কথা। প্রকৃত কথা এই যে

তিনি দেখলেন যে দেশে মদের আমদানি তো বেড়েই চলল, তবে তার লভ্যাংশ ইউরোপীয়রা সবটুকু উপভোগ না করে আমাদের দেশের লোক যতটুকু উপভোগ করতে পারেন, তাতেই দেশের লাভ। এইজন্য তিনি তাঁর অনুগত বিশ্বনাথ লাহাকে খুচরা মদ বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।' আবার এও শোনা যায় বিদ্যাসাগর মশাই নাকি দ্বারকানাথের জীবনী রচনা করার কথা ভেবেছিলেন।

দ্বারকানাথ তাঁর সাহেব বন্ধুদের কাছে উৎসাহ পেয়ে ১৮৪২ সালে ৯ই জানুয়ারী নিজের জাহাজ 'ইন্ডিয়া' তে চেপে যাত্রা করলেন— গন্তব্য ব্রিটেন। এই যাত্রায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর ম্যাকগাওনান, তাঁর একান্ত সচিব পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু চাকর, একজন মুসলমান বাবুর্চি। লন্ডনে তিনি দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল, প্রিন্স অ্যালবার্ট, বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট লর্ড ফিট্‌জেরাল্ড —এর সঙ্গে। ১৬ই জুন তারিখে মহারানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও হয়। সে প্রসঙ্গে মহারানী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 'The Brahmin Speaks English remarkably well, and is a very intelligent, intersting man'। ২৩শে জুন ব্রিটিশ সেনাদলের একটি সমাবেশে নিমন্ত্রণ পান। সেখানে তিনি মহারাণী, প্রিন্স অ্যালবার্ট, ডিউক অব ওয়েলিংটন এর সঙ্গে একাসনে বসেছিলেন। এর ক'দিন পরই বাকিংহাম প্যালেস থেকে —পেলেন মহারানীর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ। মহামান্য সম্রাজ্ঞী সেদিন তিনটি স্বর্ণমূদ্রা দ্বারকানাথকে উপহার দেন। ১৫ অক্টোবর তিনি ইংল্যান্ড থেকে প্যারিস গেলেন সেখানে সম্রাট লুই-ফিলিপ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবং দ্বারকানাথ কথা ছিলেন তিনি আবার প্যারিস আসবেন। ১৯৪২ এর ডিসেম্বর কলকাতা ফিরলেন।

১৮৪৫ এর ২৪ জুন দ্বিতীয়বারের জন্যে আবার দ্বারকানাথ লন্ডনে এলেন সঙ্গে ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথ, ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। লন্ডনে আসার ক'দিন পরেই তিনি মহারানীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর জন্য তিনি উপহার হিসেবে নিয়ে গেছিলেন সোনার বালা, তা দিলেন। ৭ই জুলাই রাত দুটোর সময় নবীনচন্দ্র একটি চিঠি লিখলেন গিরীন্দ্রনাথকে ঃ 'বাবু এই মাত্র মহারানীর কাছ থেকে ফিরলেন। মহারানীর যে প্রতিকৃতি এখন কলকাতার টাউন হলে দেখতে পাও, মহারানীর কাছ থেকে সেটি উপহার পেয়ে কলকাতার নাগরিক বৃন্দ মহারাণীকে যে মানপত্র দিয়েছিল, বাবু সেটি তাঁর হাতে দিতে গিয়েছিলেন। মহামান্যা মহারানী আরো একটি ছবি দিয়েছিলেন—তাঁর ও প্রিন্স অ্যালবার্টের মিনিয়েচর—বাবুর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য, টাউন হলের জন্য নয়। বাবু আজও একটি সান্ধ্য পার্টিতে যাবেন—রাত সাড়ে ন'টায়।' এইভাবে বিভিন্ন পার্টি এবং বিভিন্ন স্থান ঘুরে তিনি ১৮ই ডিসেম্বর আবার প্যারিস গেলেন। লুই ফিলিপ প্রাসাদে নিয়ন্ত্রণ তো করলেনই সংবর্ধনাও দিলেন। ফ্যাশনের শহর, বিলাসের শহর, আমোদের শহর, ফুলের শহর প্যারিসে দারুন আনন্দে কাটালেন তিনমাস। ১৮ই মার্চ লন্ডনে ফিরলেন। যেখান থেকে চিঠিপত্রে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, ব্যাবসার খবর, মামলা মোকদ্দমার খবর নিচ্ছেন। হঠাৎ ৩০ জুন ডাচেস অব ইনভেরনেস এর প্রাসাদে ডিনার করছেন—হঠাৎ অসুস্থতা। কয়েকদিন শুয়ে কাটালেন হোটেলের ঘরে আর সকল সময় রয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মার্টিন। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল সমুদ্রতীরে শহর সাসেক্স এ। সেখানেও শরীরের উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল লন্ডনে। ১লা আগষ্ট সন্ধ্যে ৬টা ১৫তে সেন্ট জর্নেস হোটেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ৩ তারিখের 'টাইমস' কাগজে তাঁর মৃত্যুর খবর ছাপা হল—শোকবার্তা সহ। ৭ই আগষ্ট London Mail কাগজ লিখল '' Descended from the highest Brahmim caste of India his family can prove a long and undoubted pedigree. But it is not an account of his nobility that now we review his life but on far better grounds....." ৫ই আগষ্ট সকাল সাড়ে দশটায় প্রিন্সের বাসস্থান সেন্ট জর্জেস হোটেল থেকে শবযাত্রা শুরু হয়। Blair B. Kling লিখেছেন ঃ 'মহারানী শবযাত্রার জন্য চারটি রাজকীয় শকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।' বিদেশে বিশিষ্ট এই অতিথিকে সমাহিত করা হল কেনসল গ্রীন এর একটি সমাধি কক্ষে। সমাহিত করার আগে তাঁর মরদেহ থেকে হৃদপিণ্ডটিকে বের করে নেওয়াহয়—ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবার জন্য—যাতে ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা করা

যায়। যদিও অনেক পরে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'On the Edges of Times' বইতে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে রহস্য আছে বলে মনে করেছেন। দেশে তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছল দেড় মাস পরে। তখন দেবেন্দ্রনাথ বউ ছেলে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাবার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি জোড়াসাঁকো ফিরলেন। 'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্রনাথ লিখলেন, '১৭৬৮ শকে শ্রাবন মাসে লন্ডন নগরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁর ৫১বৎসর বয়ঃক্রম। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাদ্র মাসে আমি সেই সংবাদ প্রাপ্ত হই। মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে তাঁহার কুশ পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া আমার মধ্যম ভ্রাতার সহিত গঙ্গার পর পারে যাইয়া তাঁহার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করি।' অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুরীতি মেনে দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেননি। যা করেছিলেন তা ব্রাহ্মমত অনুসারী শ্রাদ্ধ।

দ্বারকানাথের মত ব্যক্তিত্বের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান খুব আড়ম্বরের সঙ্গে হয়নি, যে রকম হওয়ার কথা। তবে সংবাদ পত্রগুলিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বর্ষিত হল যথারীতি। বেঙ্গল হরকরা ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখল ঃ 'তাঁর মৃত্যুতে নৈতিক দিক থেকে দেশের যে ক্ষতি হল, কয়েক প্রজন্ম পরে হয়তো তার পূরণ হতে পারে। কিন্তু এ দেশকে যাঁরা ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের মতে 'তাঁর তুল্যব্যক্তি' পুনরায় আবির্ভূত হবেন কিনা সন্দেহ।'

কৃষ্ণ কৃপালিনী ১৯৭৬ সালে বিলেত যান, সেখানে রামমোহন এর সমাধি ক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে দ্বারকানাথের সমাধি ক্ষেত্র খুঁজতে শুরু করেন। প্রফেসর ব্লেয়ার বি. ক্লিং তখন লণ্ডনে—যিনি আগেই দ্বারকানাথের সমাধিস্থল ঘুরে এসেছেন, তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণ কৃপালিনী খুঁজে পেলেন কেনসল গ্রীন সমাধিক্ষেত্র। কৃষ্ণ কৃপালিনী তাঁর লেখা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন অবহেলায় পড়ে রয়েছে—প্রিন্স এর সমাধিক্ষেত্র যেন নির্বান্ধব কেউ একাকী হাহাকার করছেন একান্ত শয্যায়। চারিদিকে আগাছার জঙ্গল, দেখেই বোঝা যায় কেউ আসে না এই সমাধি দেখতে। অথচ প্রিন্স এর পরিকল্পনা মত ব্রিস্টলের আর্নোজ ভেল এ রাজা রামমোহনের সুসজ্জিত সমাধি দেখতে রোজ ভীড় থাকে। এই কী প্রিন্স এর পাওনা ছিল, অন্ততঃ সমাধিতে? ১৮৬২ খ্রীঃ ১৭ই মে শ্রী মনমোহন ঘোষ, যিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলেন আই. সি. এস পরীক্ষায় বসতে, অকৃতকার্য হন এবং দেশে ফেরেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম-ব্যারিষ্টার হয়ে, কেনসল গ্রীন সমাধি ক্ষেত্র দেখে আসার পর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে লেখেন ঃ 'দেশে থাকতে এই সমাধির যে বর্ণনা আমরা শুনে এসেছিলাম তার সঙ্গে বাস্তবের সামান্যই মিল। আমরা শুনেছিলাম সমাধির উপর একটি সুরৌম্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে এবং তার গায়ে বাংলা অক্ষরে খোদিত হয়েছে পরলোকগতের কীর্তি কলাপের কথা। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল সবটাই মনগড়া মিথ্যা কাহিনী। সমাধির উপর একটি তিন হাত লম্বা প্রস্তরখণ্ড (মার্বেল নয়) শায়িত এবং তার উপর কেবল এই কথাগুলি খোদিত ঃ

D. T.

Dwarakanath Tagore

of Calcutta

Absit : 1st August, 1946.

কেবল এই কটা কথা যেন তেন প্রকারেন সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদাই করা। কবরের চারদিকের লোহার শিকলের বেষ্টনী, চারকোনায় চারটি মৃতপ্রায় সাইপ্রেস গাছ। পাশেই দেখা গেল কতিপয় সুদৃশ্য স্মৃতি সৌধ। সর্বক্ষণ মনের মধ্যে আমরা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম এই কথা ভেবে ঃ যে মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বিলেত এসেছি, বিলেতে আসতে পাবার জন্য একমাত্র যাঁর কাছে আমরা ঋণী, তিনি একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কবরে শুয়ে আছেন, অথচ যারা তার চাটুকার সভাসদ-মাত্র ছিল—তারা দিব্য মার্বেল পাথরে তৈরি সমাধিতে শয়ান এবং তাদের সমাধি প্রস্তরে কত প্রশংসাসূচক বাগ্‌বিস্তার। আমি শুনেছি আপনার জ্যাঠামশায় কে (মহর্ষি) হাজার হাজার টাকা খরচ করতেও হয়েছিল ওই কবরটার জন্য। খোঁজ নিয়ে জানলাম খরচ হয়েছে বড় জোর দুই পাউন্ড অর্থাৎ কুড়ি টাকা।"

এর পর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বংশীয়, একটি চিঠি পান মেজর হার্বার্ট ডব্লু ডেন্ট—ব্রডলী, ব্রোকেনহার্ট হান্টস থেকে, ১৯০৬ এর ২৫ জানুয়ারী তারিখে। মেজর ডেন্ট তাঁর চিঠিতে কেনসল গ্রীন সমাধি ক্ষেত্রের সুপারিন্টেন্ডস্ট টি. বার্গেসের রিপোর্টটি পাঠান। সে চিঠিতে বার্গেস লিখেছেন ঃ 'সমাধি নং ৬২৪৭' 'ঠাকুর' এর অবস্থা খুবই শোচনীয়। পাথরের খুঁটিগুলি চারপাশে একেবারে বসে গেছে। শিকলগুলি জং ধরে একপ্রকার নষ্ট হবার সামিল। ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, খোদাই করা লিপিতে কালো রং লাগানো, পাথরের খুঁটি উঠিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা, শিকলগুলি ঘষে মেজে দু-কোট রং দেওয়া—এই সব মিলে খরচ পড়বে ৪ পাউণ্ড, ১৫ শিলিং। তাহলে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

মেজর ডেন্ট এর চিঠির পরবর্তী সময়ে প্রায় একুশ বছর পর কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে নির্মলকান্ত সেন ৪নং ওকউড কোর্ট, কেনসিংটন থেকে ১৯২৭ খ্রীঃ ১০ মার্চ একটি চিঠি লিখলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। চিঠির বিষয় সেই এক। সমাধির বর্তমান অবস্থা খুব করুন, মেরামতি ও সংস্কার প্রয়োজন। দুটি প্রশ্ন মাথায় আসে, পর্যাপ্ত কারনও আছে।

এক. কেন বারবার পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে 'প্রিন্স' এর সমাধির সংস্কার প্রয়োজন। প্রিন্স কী খুবই অপ্রয়োজনের হয়ে গেছিলেন সমকালীন ঠাকুর পরিবারের কাছে। যেখানে প্রিন্স এর পুত্র 'মহর্ষি' এবং পৌত্র 'বিশ্বকবি'। দায়িত্বশীলতায় কম পড়েছিল এতটাই নাকি ব্রাত্য করেই রাখা হয়েছিল মানুষটিকে।

দুই. বিশ্বকবি, তিনি বেশ কয়েবার বিলেত যান বলে আমরা জানি। এবং 'গীতাঞ্জলি' পরবর্তী যুগে বিলেত যাঁর ভক্ত অনুরাগী সংখ্যা এবং রয়্যালটির পরিমান খুব কম ছিল না। যিনি চাইলে হত দরিদ্র সমাধিটি প্রাসাদের রূপ দিতে পারতেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সমাধির সংস্কার তো দূর—সমাধিস্থল দেখতেই যাননি— কেন? জানতেন না নাকি মনেই পড়েনি বা প্রিন্স অপাঙ্‌তেয় রবি ঠাকুরের জীবনে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। দ্বারকানাথ ঠাকুর—বিস্মৃত পথিকৃৎ—কৃষ্ণ কৃপালিনী (বাংলা অনুবাদ ক্ষিতীশ রায়) ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

২। আত্মজীবনী ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অলকানন্দা পাবলিশার্স

৩। Zamindar Rabindranath.....Kumud Biswas

৪। Dwarakanath Tagore and the Emerging Tea Industry : Prithvinath Tagore.

৫। Dwarakanath Tagore and The Age of Enterprise in Eastern India : Blair B. Kling.

৬। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। Article on BANGLAPEDIA : Tagore, (Prince) Dwarakanath

৮। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অঞ্জলি বোস।